লেখকের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

যে-কোনো নিশ্বাসে
চারিদিকে পৃথিবীর
ছায়ার সঙ্গে পা মিলিয়ে

সূচীপত্র

অসমাপ্ত শর্ত

মাঠের ওপার থেকে ডাক দিলে "সমর"। অথচ
মাঠের এপারে তা শোনাল অনেকটা যেন ঠিক
"অমর"-এর মতো। প্রায় এক মাইল নীলিমার নিচে
জনশূন্য জ্যোৎস্না, অর্থাৎ গভীর স্তব্ধতা,
আর যতখানি দূরে গিয়ে ডাক দিলে নামের ভিতর থেকে
দ্বিতীয় আরেক অর্থ ব্যাকুল বেরিয়ে আসে—আমি
বসন্তের অসমাপ্ত শর্তে আরো বহুদূরে ভৌতিক জ্যোৎস্নায় একা ডুবে যাচ্ছি বলে
"সমর" অথবা "অমর" শব্দের মধ্যে চেনা "মর" ধ্বনিটির দিকে
আমার শরীর-ভরা মর্তকাতরতাগুলি পাঠিয়ে দিলাম।

একটি বাস্তবিক গদ্য কবিতা

একত্রিশ বছর, তিনটে বই, কমবেশি সাত-আটশো পাতা পদ্য।
কিন্তু সেই কবিতাটির দেখা নেই।

এক-জন্মের বেশি সময় কারও থাকেনা, তাই দৌড়; প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে নিশ্বাসের সহস্র বুদবুদ ভেঙে চারণক্ষেত্রের দিকে রাখালের মতো ছুটে যাওয়া। ছিল ঘাস, আছে মরুভূমির মতো সূর্যশাসিত লক্ষ-লক্ষ কিলোমিটার বালু। বাঁশি থাকলে বাজাতে পারতাম—নেই, তাই এলোপাথাড়ি যাজক শরীরকে কাঁদিয়ে, কাঁপিয়ে, কেবলই আঘাত; যদি কখনও ঝর্ণার মতো শব্দ হয়, ফিরে আসে বাঁশি।

এক-জন্মের অধিক সময় কাউকে দেওয়া চলে না। লিখতে শেখার পর থেকে চিরকাল 'সৃষ্টি' ও 'যৌবন'কে যতটাসম্ভব কাছাকাছি লিখবার চেষ্টা করেছি বলে আমার সময় আরও কম। এত কম যে আজকাল অসম্ভব সাদা চাদরেও ঘুম আসে না। এত তেষ্টা পায় যে পেয় সমুদ্রের কথা ভাবি। খিদে বাড়াবার জন্য যে সব ৫০ ও ৬০-রা প্রাতর্ভ্রমণে বের হন, খিদে ভোলবার এবং স্বপ্নহীন নিদ্রায় রাত্রিযাপনের জন্য দম্পতি যারা এখনো কিছুক্ষণ শয্যায় যৌথ ব্যায়ামের প্রয়োজন অনুভব করে, না, বর্তমান বোধনে তাদের কারুকেই আমার দরকার নেই। তাই চিৎ, অর্থাৎ সমস্ত জাগ্রতসময় আকাশমুখো শুয়ে দেখি সিলিং ধরে পূর্বপুরুষের মতো কেবলই ঝুল খাচ্ছে কবিতা লেখার মহান বিষয় "মৃত্যু"। যেন প্রতিটি লিপিবন্ধ মর্ত্যধারণার জবাবদিহি চাইবার জন্যই তার অপেক্ষা। ছন্দে বলতে হলে

"তুমি শেষ, তুমিই প্রথম
একমাত্র সিদ্ধ ব্যতিক্রম"

অর্থাৎ বলতে চাইছি "মৃত্যুই" একমাত্র অনিবার্য কাব্যবিষয়—যার সম্পর্কে কবির বোধ, নিশ্বাস থেমে যাবার পূর্বমুহূর্তে অবধি নতুন। মৃত্যুকে তাই সংখ্যাহীন উপমা বা বিশেষণেও বদ্ধ করা যায় নি। প্রেমের মতো তার রাস্তায় বাগানবাড়ি, ঘাগরা-কাঁচুলি-লোপাট অসভ্য বাতাস নেই। আছে সড়কের অন্তিম প্রান্তে এক দক্ষিণদুয়ারী দুর্গ; কামানবন্দুক এবং দূরবীণ এড়িয়ে যার ভিতর শুধুই প্রবেশ, নির্গমন নেই।

সেই পথের অনেকটা এসে আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছি শরীরের সমস্ত অসমাপ্ত বারুদ দ্রুত বুকের এক-জায়গায় এসে জড়ো হচ্ছে। টের পাচ্ছি বিস্ফোরণের মতো একটি স্বর্গ-কাঁপানো উর্বশী কবিতা শব্দকে আক্রমণ করার জন্য

ঘুঙুর বাঁধছে। চার-চোখ শালীনতার অধিক সময়েও ভিন্ন না হলে ভয়ংকর অথচ স্বল্পস্থায়ী অগ্নিকাণ্ডে দাউদাউ জ্বলবে নিজস্ব চিতা। যে-যুগকে একদিন ফুসলিয়ে রাস্তায় বের করে এনেছিলাম, এই বিংশ শতাব্দীতেও সহমরণে যাবার মতন সতী হয়ে সে তখন এসে পাশে শোবে। উপমা দেয়া যাক—

যেমন মুহূর্তের অশনিসম্পাত অসংখ্য বৃক্ষপদবী পুড়িয়ে ছারখার করে, তেমনি মোক্ষম সে-কবিতাটি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর শতশত রাত্রিজাগরণময় ব্যক্তিগত ছন্দ-সাম্রাজ্য পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে। যেন কোনদিন গোয়েন্দা কেউ চিনে না বের করতে পারে আমার ইহজন্ম—এই আর কি।

এ-পর্যন্ত লিখে থামতে হ'লো। কালি ফুরিয়ে গেছে। খুবই বিরক্ত হয়ে স্বদেশী সুলেখার কাছে যাই। এক-মিনিটেই কলমভর্তি। তারপর এক গ্লাস জল। জল খেয়ে বাথরুম। পেচ্ছাব করতে গিয়ে ঝাঁঝরির মুখে দুটো সংগমবন্ধ আরশোলাকে দেখে, এক বালতি জল ঢালতেই তারা পাইপ দিয়ে নেমে গেল নিচে অর্থাৎ মৃত্যুতে। বোধহয় এ-রকমই এক মিথুন হত্যার পাপে আমাদের ধর্ম-গ্রন্থের এক রাজা অভিশাপগ্রস্ত হয়ে যৌবনের সাধ্য হারিয়েছিলেন। আমার কিছুই হলো না; যেহেতু দক্ষিণদুয়ারী দুর্গশীর্ষে অর্ধেক সবুজ এবং অর্ধেক হলদে মেশানো পতাকা এখন দেখতে পাচ্ছি।

সুতরাং অবশিষ্ট আমি যে-ভাবে বাঁচতে চাই, যে-ভাবে চিৎকার করে ঘরের ফর্সা দেয়ালে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের উজ্জ্বলতা থেকে লক্ষগুণ শরীর-চৌচির-করা সূর্য জ্বালতে চাই; শব্দগুলিকে পাখির মতো উড়তে শিখিয়ে বলি, "কাছে-কাছেই থেকো, কখন প্রয়োজন বলা তো যায় না"—কিন্তু যাঁড়ের গোবর; যে নিজেই এই একত্রিশ × তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের একটিও ইচ্ছেমত বাঁচতে বা খুশিতে কাটাতে পারল না...... সামান্য একটা ফড়িং কী করে তাকে ভাল চোখে দ্যাখে!

আচ্ছা ঠিক আর কতদিন বাঁচব? জানতে পারলে শব্দজীবনের সঙ্গে এই বছর-বছর শারদীয় ইয়ার্কি আরও মন খুলে করা যেত। ভালবাসা থেকে অনেক-গুণ বাস্তবিক ছোট ললনাকুলকে এয়ারপোর্টে বলা যেত, "দেখছেন না লাস্ট প্লেন এসে গেছে। আপনারা শীঘ্র লাইন করে দাঁড়ান, আমি গার্ড-অফ-অনর নেবো। না, ভয় নেই, কারো চোখের দিকে আমি তাকাই না।" কতদিন বাঁচব আর?

ডাক্তার বা ভগবানকে জিজ্ঞাসা জানালে হয়তো হতো। কিন্তু যাকে চাই জীবনের তেমন প্রকৃত উপাধিধারী উত্তরাধিকারী কোনও সন্তানের দেখা নেই এখনও। "বাবা, আমি তোমার মুখে আগুন দিচ্ছি, মুখাগ্নির এই আলোয়

পথ চিনে তুমি স্বর্গে যেও”—যে বলতে পারতো, সেও কি আজ না-লেখা কবিতার মতো অপেক্ষায় আছে? এইসব চিন্তাই বারবার জমে-উঠতে-থাকা বারুদকে সজল করে তোলে, অর্থাৎ বিস্ফোরণ পিছিয়ে যায়, জন্ম পিছিয়ে যায়; এবং মনে পড়ে, অন্যান্য শিল্পের মতো সন্তানের সৃষ্টিও কম মর্যাদাসম্পন্ন নয়।

কোনও-কোনও রাতে যখন কিছুতেই ঘুম আসে না, তখন শেষরাতের ফিকে অন্ধকারে এসে বাগানে বসি। এই সাজানো বাগান কোনও দিন শুকিয়ে যাবার ভয় নেই, কেননা বছর-বছর অজস্র পোষ্যপুত্র ফুলে আমি এর যৌবন ফিরিয়ে দিই। স্বাস্থ্যবান বীজ, খানিকটা রুটিনমাফিক জল, তাতেই আমার চোখের সামনে তারা পাপড়ি মেলতে রাজি হয়।—তোমার জন্য কিন্তু আমি নরক পর্যন্ত গিয়েছিলাম। আমাদের ধর্মে স্বর্গে যাবার জন্য এত চরিত্রবান হুড়োহুড়ি যে অধুনা সেখানেও স্থানাভাব। অতএব বারংবার ফিরে আসতে হয়েছে বাগানের কাছে, ভোরের কাছে। আমি আমার একান্ত চেয়ারটিতে বসে দেখছি, সদ্য-স্নাতা কুমারীর দল শিবমন্দিরের দিকে চলেছে। ওরা লিংগের পুজো করে। কিন্তু ওই অস্বাভাবিক হ্রস্ব অকিঞ্চিৎকর সন্তানপ্রতীক কী করে যে সোমত্ত নারীর পূজনীয় হতে পারে, ভেবেই পাই নি। শিবের সমান পাগলা-ভোলা স্বামী পেলে—ওরা তো জানে না ওদের কী দুর্দশা হত! সতীদেহের খণ্ড-খণ্ড শারীরিক বিরহ শিব কী তাণ্ডব মত্ততায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, আজও আমরা ভুলতে পারি নি বলেই এখনও কামাখ্যায় আমাদের যোনিপুজো। কিন্তু কেন আমি ওই কুমারীদের কথা ভাবছি? ওদের প্রত্যেকের শরীরে কয়েকজন করে সন্তান ওতপ্রোত বলে কি? সঙ্গিনীকাতর যে-বেড়ালটা মাঝে-মাঝে মানুষের মতো থমথমে গলায় ডেকে আমার অক্ষর নষ্ট করে তাকে আমি ঐ শিবমন্দিরের দিকে যেতে বলি। সে কথা বোঝে না, তবু কখনো-সখনো স্থির অবিকল্প চোখে তাকিয়ে আমার চোখের তাপ ও সততা পরীক্ষা করে। শেষে অসম্ভব উত্তেজিত লেজ নাড়তে-নাড়তে বেরিয়ে যায়। আমিও কবিতা থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টায় শার্টপ্যান্টের নিচে ন্যাংটো বাঙালীশরীর বের করে এনেও দেখেছি সভ্যতা মুখ থেকে একচুল নড়ে নি। পুলিশ এবং মন্দিরের জন্য যে-সব কথা এখনও লিখতে ভয় পাই, তারাই আমার জন্ম নষ্ট করছে। তাই একমাত্র বাথরুমে প্রেমের প্রাপ্য শোক ঝরে যায়। হয়তো ভালবাসতে হলে এমনই চোখ এবং পুরুষত্ব সমান ঝরিয়ে কাঁদার নিয়ম।

এক-জন্মের বেশি সময় কাউকে নাকি দেওয়া যায় না। অথচ ইতিমধ্যেই কম-বেশি সাত-আটশো পদ্য লেখা হলো। সুতরাং পৃথিবীর কাছে এখন নিশ্চয় কিছু একটা চাইতে পারি। নারীর হিসাবে চাইলে অনেক আগেই তা

নিতে পারতাম। সে-বিষয়ে টেলিফোনে কথা বলবার চেষ্টা করেও দেখেছি। কেবলই ক্রস-কানেকশন। ঈশ্বর তৃতীয় পক্ষ হয়ে কথা বলেন। যত বলি "প্লিজ আপনার রিসিভার নামিয়ে রাখুন, আমরা আগে থাকতেই একটা জরুরী বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম।" কিন্তু কে কার কথা শোনে! তিনিই যে প্রতিটি অণু-পরমাণুর স্রষ্টা—বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন। তখন প্রচন্ড রেগে অফিসের বড়বাবুর চেয়েও গম্ভীর গলায় বলি, "মিস্টার ঈশ্বর, টেলিফোন যে আপনার সৃষ্টি নয় তার জ্যান্ত প্রমাণ কিন্তু আমার হাতে আছে।" তিনি হাঃ হাঃ হাসতে হাসতে বলেন, "কান দিয়ে আর কতটুকু শোনা যায় হে; আমি লাইন ছেড়ে দিলেই কি তোমাদের কান তোমাদের হৃদয় হয়ে উঠবে?" তিনি বলে চলেন, "এইতো সেদিন রিসিভার তুলে—হ্যালো প্রেম, ভাল আছ, কতদিন দেখি নি তোমায়—উচ্চারণ করেছিলে, প্রেম শুনেছিল?"

আমার বিষম শীত করে। লজ্জায় মাথা ক্রমশ এতটা ঝুলে পড়ে যে আমি গোড়ালির পেছন পর্যন্ত দেখতে পাই। আমার দুঃখ, আমার একত্রিশ বছর-ব্যাপী অপমান এবং কঙ্কালের মতো হাজার হাজার সাদা পংক্তি, মাথার চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে।

অবশেষে

শিবমন্দিরের লিংগ কিংবা ক্রুশবিদ্ধ যিশুর উদোমবুক স্বল্পবস্ত্রাবৃত ধার্মিক যৌন আকর্ষণের সম্মুখে রমণীকুলের মতো সৎ এবং স্বাভাবিক ভিড়ের মধ্যে আমি—দীনের চেয়ে দীন—খুব নিচু-গলায় বলি, "ভালবাসা অর্থে যেহেতু একত্রিশ বছর, তিনটে বই, একদিনের জন্যও ইচ্ছেমত বাঁচতে না-পারার দুঃখ, সুতরাং তোমাকে অর্থাৎ ভালবাসাকে অর্থাৎ মৃত্যুকে এতদিন কেবলই স্ত্রীলিংগে লিখে ব্যবহার করেছি। আজ আমাকে তুমি তার শাস্তি দাও, সন্তানের ছলে আমাকে আরেকবার আবিষ্কার করে শাস্তি দাও।"

কেননা একদা পুরুষের যে কর্তিত ঊরুতে তোমার জন্ম হয়েছিল, তুমি পৃথিবীর প্রতিটি পুরুষকে তার শিল্প, মেধা ও প্রেমসমেত খুব এক খারাপ জায়গা দিয়ে পৃথিবীতে বের করে আজ তার চরম প্রতিশোধ।

প্রতিশোধ

প্রতিশোধ নিচ্ছ!

মল্লিকার উদ্দেশে জনৈক শ্মশানবন্ধু

ভেবেছিলাম তোমাকে আর ছোঁব না সন্দেহে; ওই
সাদা শাড়ি, বেপাড়ায় বেল ফুল ছাড়া
কোথাও শুভ্রতা আছে কিনা জেনে নিতে চুম্বনে সশব্দ হল
সারা পাড়া
আলিঙ্গন ক্রমশ চন্ডাল হল হৃৎপিন্ড অবধি
শুধু বাকি, বাকি ছিল পদাঘাতে অহল্যা উদ্ধার...

মল্লিকা তখনও ফুল, বাংলাদেশে প্রিয় ফুল, যদি
সাদা শাড়ি ছাড়া ছিল তোমার মৃত্যুকে ঢাকা বারণ মল্লিকা!

কয়েকটি পাথর শুধু ছদ্মবেশে এখনো দাঁড়িয়ে;
একা, জনতার চেয়ে উঁচু, রাজপথের বিখ্যাত মোড়ে-মোড়ে
বাংলাদেশের গত সব সুসময় আজ ভাস্কর্য পাষাণে
জন্মসন মৃত্যুসন নিয়ে চুপ। দোতলা বাস থেকেও কেউ
তাকিয়ে দ্যাখে না ঐ সব অতীত অভিমান।
আমি মাঝে-মাঝে
ইতিহাস ভাবি, কেন-না ভূগোল শুধু দ্বিখণ্ড বাংলার ভাষা
নিয়ে যায় গিরিতুষারের ওপারে, হয়তো প্রবাসী দর্শনে।
তবু গন্ধ পাই, কলকাতার গন্ধরাজ খাঁটি বাঙালীর মতো
এখনও প্রথম ঢোকে জননী-মন্দিরে। অথচ তখনও দেখি
সূর্যহীন নিশান চলেছে অহংকারী ফাল্গুনের পলাশ ডিঙিয়ে, দেখি
অপ্রয়োজনীয় বারুদ আকাশ নিবিয়ে জ্বালে পাতালের আলো,
দেখি দ্বিখণ্ড ফুসফুস ক্রমে আরো খণ্ডে ভাঙতে থাকে
আর নিশ্বাসের কষ্ট দেখে ত্রিশ মাইল উপরে ওঠে চাঁদ।
ভুল জ্যোৎস্নালোকে স্পষ্ট দেখা যায় শুধু
পাথর, পাথর, বাংলাদেশ পাথর,
না হলে পূর্বপুরুষ পাষাণে কেন
পাখিরা বানায় বাসা, মলত্যাগ করে রাখে মানুষের বেশী।

আমি তো থাকবই

আমি তো থাকবই শুধু মাঝে-মাঝে পাতা থাকবে সাদা;
এই ইচ্ছামৃত্যু আমি জেনেছি তিথির মতো, কয়েকটি আঙুল
ইতিমধ্যে তুলে নেবে ক্ষুধার সংসারী শস্য, অসুখের উৎকণ্ঠ ওষুধ,
চোখের নক্ষত্র থেকে হয়তো-বা ঝরে যাবে
হৃদয়ের আলো-লাগা সবুজ ক্ষরণ।
তবু আমি তো থাকবই তোমাদের দুঃখের অতিথি, আমি ছাড়া
দেবতার হাত থেকে কে খুলে পড়বে চিঠি, কার
রক্তের আদেশে মালা হয়ে গড়ে উঠবে ফুল?
আমি দিয়ে যাব তোমাদের সঙ্গোপন গন্ধর্ব বিবাহ;
শুধু মাঝে-মাঝে
অক্ষর থামিয়ে দেবে শিশুর পবিত্র হাত, তার শরীর-উপচানো সূর্যে
সাদা হয়ে থাকবে ফুলের প্রথম রঙ
এই স্বেচ্ছামৃত্যু আমি নিজেই চেয়েছি।

মাঠে যা গড়ায়

মাঠে যা গড়ায় তা তো খোকার নিষ্পন্ন লাল বল।
এ-ভাবেই আয়ু আজও খুব খেলা করে ঐ প্রশান্ত সবুজে;
এ-ভাবে উল্লাস ওঠে যৌথকণ্ঠে, এ-ভাবে এখন
এগার জনের মধ্যে একজন গোল করে বসে।
আমি মানুষের চোখ নিয়ে
পায়ে-পায়ে বিদ্যুৎ-চমক লাল ঘোরা-ফেরা দেখি।
কে কাকে হারায় দৌড়ে,
কার বুকে অক্সিজেন বেশি কাজ করে
এখন পশ্চিম বারান্দা থেকে তা স্পষ্ট বুঝতে পারি।
ভোরে, ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে
যখন শিশির, যখন সূর্যের পাখি
বৃদ্ধের ছায়াও বালকের মতো প্রায় ছোট করে ফেলে,
আমি চুপিচুপি নিচু হয়ে পদচিহ্ন খুঁজি, যেন
আমার বাবার, তারও বাবার সমস্ত লাল বলের বিষাদ
ফর্মহীন প্লেয়ারের মতো চুপ করে আছে. তাদের সন্ততি
এখন আসন্নবেলা হেলে-যাওয়া দিগন্ত-আলোয়
রেফারী-বিহীন খেলে, গোল দেয়, আর
হাফটাইমে বসে পড়ে ঘাসের উপর।
তখন সম্পূর্ণ স্থির পদাঘাতহীন
শান্ত লাল বলটিকে সবুজ ঘাসের দেহে মনে হয় ক্ষতের মতন।
মনে হয় সন্তান জন্মালে পিতার বয়স যেন
মৃত্যুর নিকটে চলে যায়।

মানুষ পারে

না, আর কখনও আমি ব্যবহার করব না তোমাকে
শিশুকে মধুর মিথ্যাও শেখানো পাপ
তাই আমি আকাশ শেখাতে গিয়ে
আর কখনই পুনর্বিবেচনা করব না পূর্ণিমা।
পূর্ণিমা শব্দটি বড় মুগ্ধকর, কেননা সেখানে আজও এক
"মা" মিশে রয়েছে।
একদিন, সেই কবে বহুদিন
আগে, আমার মা প্রতি চান্দ্র সন্ধ্যাবেলা সংসার থামিয়ে এসে
মল্লিকা, টগর, করবীর সমবেত সুগন্ধের
ভিতর আমাকে কোলে নিয়ে বাইরে দাঁড়াতেন; আমি
মাকে ভীষণ বিশ্বাস করে ভাবতাম
একদিন নিশ্চয়ই চাঁদ টিপ দিয়ে যাবে।
অথচ এখনও আমার কপাল খালি পড়ে আছে,
শুধু খণ্ড-খণ্ড কলকাতার নীলিমায় তাকিয়ে ভাবছি আমার শিশুকে
আমি কোন নতুন খেলার সঙ্গী খুঁজে দেবো শূন্যে!

শিশুকে মধুর মিথ্যাও শেখানো পাপ
না হলে বলতাম দেবতা যা পারে না, মানুষ
তা পারে। আনন্দে পদানত জ্যোৎস্নাকে কাঁপিয়ে তীব্র
শেষ বলে উঠতে পারে, "কোথায়, কোথায়
তুমি হে দেবতাশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর? আমরা
পাথর, গহ্বর, ধুলো ছাড়া
কেন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না এখানে?"

বিস্মরণ

তুমি কি চন্দন? দারু ও পাথরের
ক্ষিপ্ত ঘর্ষণে তুমি কি সামাজিক
বিবাহ, সংস্কারে, আজও নিসর্গের
সমান সুগন্ধ মন্ত্রে নিয়ে আস?
আমার নিশিদিন ভাষার প্রবাসও
তেমনি বনবাসী বিষয় চন্দন!
অথচ এ-বিদায়ে পিতৃসত্যের
অশ্রু নেই, আমি জন্ম ভুলে গেছি

নির্বাসনে কেউ পাথরে ঘষে মন?

ইহুদি মেনুহিনকে অনুরোধ

ওর ভ্রান্ত আঙুলগুলি ধরে কে থামাবে! ইহুদি মেনুহিন আপনি কি একবার
পার্ক স্ট্রীটের এই পানশালায় এসে বলে যাবেন যে
বাখ্-এর "ডাবল কনসার্টো" কখনই "ই মেজরে" বাজানো উচিত নয়।
বাজালে, পঞ্চম পেগ আসক্তির ওপারে-যে-নদী, তার সূর্যোদয় সাদা পালে আর
ফিরে আসবে না; এবং আমিও তুখোড় ওই জনতাবধূর
শরণার্থী স্তন কিংবা মাৎ শ্রোণীদেশের আড়ালে যে-অশ্রুজল
এখন ফক্সট্রট নাচছে তাকে অতগুলি শেয়ালের মধ্যে বলতেই পারব না
—মা-জননী "ডি-মাইনর" ছাড়া বাখ্ কেন শুধু শুধু সঙ্গীতের স্বর্গ ছেড়ে
এই আত্মবিস্মরণের পাতক প্রতিযোগিতায় নামতে হবেন রাজী!
আপনি রমণী (শিল্পীরা শুনেছি একমাত্র বাধ্য রমণীর) আপনিই একটু
বুঝিয়ে বলুন।
আমি তো গাহন চেয়ে নদীকে টানতে-টানতে প্রিন্সেপ ঘাটের কলকাতায় এনে
তার ঢেউ কেড়ে, হাতের গ্লাসের মতো বান্ধবদর্পণে মুখ দেখবার চেষ্টা করে
এখন নিজের কাছে একা বসে আছি। শ্মশানে শবদাহের পর যেমন বিরহ
শূন্যমেধা সং বসে থাকে।
কিন্তু...কিন্তু ভায়োলিন হাতে থাকলেই কি
সঙ্গীতের মতো নিশ্বাসের সমার্থবোধক ভালবাসা নিয়ে বাণিজ্য মানায়? না-না
আর নয়..."উইল য়ু স্টপ ইট?" না হলে এখন
হৃৎপিণ্ডের থেকেও টাটকা লাল এই নেশা-ভর্তি গ্লাস
তোমার মাথায় আমি চুরমার ভাঙব ইডিয়েট!

মিশুক রক্তের সঙ্গে নেশা, নেশার সঙ্গে যে-অন্ধকার
আমার গানের গলা চেপে ধরে কোনো সমুদ্রসিদ্ধান্ত সুর উঠতে দিচ্ছে না, সেই
আদ্যোপান্ত অন্ধকারে কেবল তোমাকে, শুধু তোমাকেই সহ্য করা সম্ভব
ইহুদি মেনুহিন।

(হোটেল-ম্যানেজারের কণ্ঠ: "হলের সমস্ত আলো
এক্ষুনি নিবিয়ে দাও, পুলিশকে টেলিফোন কর।")

কন্যাকুমারিকা

এইখানে ভারতবর্ষের শেষ
ভগবানের ভিড় নেই, শুধু অকৃত্রিম জল
নিরুদ্দেশ
যাত্রার আগে শেষ সন্ন্যাসী-শিলার পদতল
ছুঁয়ে দেখছে ওঠে কিনা শ্লোক।
অনেক কুড়ানো রোদ, ঋষির নামের নামী নক্ষত্রদ্যুলোক,
ধাবমান সূর্যের আগ্নেয় অনুবাদের গায়ত্রী
সব জড়ো হয়েছিল তবু কিছুই হল না। ধাত্রী
স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে দেখল সমস্ত শুশ্রূষা
তার ব্যর্থ, পাহাড় দুর্বল, তপোবন রাক্ষস প্রধান, ঊষা
ঘুমন্ত ফুলের তীব্র গন্ধবান জেগে ওঠা নয়।
মানুষ না জনতা?
বহুবচন বেঁচে থাকার ভিতরে, মনে হয়
কেউ কারো মুখ সঠিক চেনে না, কথা
শুধু নৈঃশব্দের রক্তপাত;
এত স্মরণীয় গ্রন্থ, জাতিস্মর ছন্দের আঘাত
তবু তীর-বেঁধা হরিণের ভুল রক্ত নিয়ে স্বাক্ষর সাজানো।
সমুদ্র! তুমি তো জান
মানুষ কী করে সেতু বাঁধে
মহাদেশ ভরে ওঠে শস্ত্রের সংবাদে
রক্ত ক্রমে সাগর বাড়ায়।
আমি ঐ সব নীলের শরীর জানি,
জানি প্রেম, জানি
কিশোরী কন্যকা কেন
দশক শরীর নিয়ে মন্দিরে দাঁড়ায়।

শুধু প্রভেদের মধ্যে ঐক্য নাকি ছিল, সেই
যুধিষ্ঠির মিথ্যা খুঁজে-খুঁজে আজ শেষবার এই
সন্ন্যাসী-শিলায় পা রেখে
রাগে দুঃখে দাঁড়িয়েছি একা;
সমুদ্র কোথায় যাবে—নিরুদ্দেশে? যাও

শুধু তিন-ভাগ জলের ভূগোল শেখা
শেষ হলে ফিরে এসে, কথা দাও
দেবতার ভিড়ে-ভরা ভারতবর্ষকে
বলে যাবে, গ্রন্থের বিশ্বাস
কোথাও হয়েছে কিনা স্থায়ী ইতিহাস।

মৃত চিঠির দপ্তর

হাজার খুঁজেও পাওয়া গেল না, কেউ কি আছ? কেউ কি ছিলে?
ভুল ঠিকানায় ঘুরতে ঘুরতে শব্দগুলি ফেরৎ এল।
ভালবাসা ফেরৎ এল, বাবার অসুখ ফেরৎ এল,
দয়াল তোমার টুকরো-টুকরো আলো-আঁধার—মূল্য দিলে
অশোকস্তম্ভে আঁটানো যায় যতটা প্রাণ
ঠিক টিকিটে ভ্রমণ চেয়েও তারা এখন
ফেরৎ এল। মানুষ লিখতে খানিকটা বোধ হয় ভুল হয়েছে!
ভুল হয়নি চিনতে কবর চৌরাস্তার মোড়ে; যখন
চতুর্দিকেই রাস্তা তবু যাবার যোগ্য বিদেশ নেই।
বিদেশ শেষ বলেই এখন একলা ওই যক্ষ পাষাণ
ইহজন্ম পাহারা দিচ্ছে......কেউ কি ছিলে কেউ কি আছ!

ডাকটিকিটে ভ্রমরজীবন আটকে আছে।

মাঝির প্রশ্নে

ওই ওই ওই যে খানিকটা দূরে নিশানের মতো ব্যগ্র একটা পলাশ
গাঢ় লাল হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছেন,
হ্যাঁ, ওটা পেরিয়ে বয়ে
এক ক্রোশ গেলেই পাবেন খেয়াঘাট। আপনি তো
নিশ্চিন্তপুরেই যাবেন;—বলেই
সেই পথচারী আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হল
ভেবে দ্রুত উল্টো দিকে হেঁটে
ক্রমশ বিদায়ে ছোট, আরও ছোট হয়ে-আসা উত্তরের মতো
বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেলেন।
আমি এমন সহজে খেয়াঘাট নদী পার হয়েই যে
নিশ্চিন্তপুরের প্রান্তে পেঁাছে যাওয়া যায়
জেনে হাঁটতে-হাঁটতে আকাশের সুনীল উদারতার নিচে একা হাঁটতে-হাঁটতে
খেয়াঘাটে এসে হায়! ভালবাসার মতন দৈব নৌকাগুলি সব
স্পষ্ট মাঝিহীন দেখে
হঠাৎ রাজ্যের ক্লান্তি
অট্টহাস্যে ঢেউ-এর দ্রুততা
আর থেকে-থেকে ঊর্ধ্বে ব্যাকুল বৃত্তের ছলে ক্রমাগত শূন্য আঁকা
চিলের চিৎকারে
মনে হল কোনও প্রশ্ন সম্পূর্ণ উত্তরভরা পূর্ণতাকে কখনও পাবে না!

যেদিন চিঠি থাকে না

যেদিন চিঠি থাকে না আমি স্টেশনের দিকে বেড়াতে যাই। ইঞ্জিন, বন্দী বাক্স, সানটিং, কেবলই এক লাইন থেকে অন্য লাইনে চলে যাওয়া দেখতে-দেখতে ভাবি অন্তত আজকে আর আমার কোনো সঙ্গী নেই; ডাকটিকিটের ভিতরে জমানো এক-একটা অক্ষর থেকে ছিটকে আসা স্নেহ বা ঘৃণার উত্তর আমাকে আজ লিখতে হবে না। শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রীচরণেষু থেকে ছুটি।
স্টেশনে খুব ভাল লাগে। এমন আত্মভুক্ নিকেতন আর নেই। মানুষ ওঠে, মানুষ বগী থেকে নেমে যায়। প্রত্যেকের মুখে ভিন্ন ভিন্ন দ্রাঘিমার জলবায়ু। কেউ টিফিন-ক্যারিয়ারে ব্যস্ত, কেউ 'আরে ভুবন না!' চিৎকার করে খুশির বুদবুদে ফেটে যেতে-যেতে বলছে 'আমি এ-ট্রেনেই এলাম আর তুমি ফিরে যাচ্ছ, হাঃ হাঃ!' অর্থাৎ বিপরীতমুখী দুই বন্ধুর দেখা হল। কখনো চোখে পড়ে মফঃস্বল প্ল্যাটফরমে ধূসর কোম্পানীকোর্তা গায়ে দাঁড়িয়ে আছে চেকার। সে প্রতি মানুষের প্রবাস মিলিয়ে দেখছে টিকিটের সঙ্গে। এক হাতে নীল অন্য হাতে লাল নিয়ে ব্যস্ত গার্ডবাবু বারবার কব্জিতে দেখছেন সময়। লাইন বদলাবার সংকেত-বাঁশরী মুখে তিনি খুবই গম্ভীর এবং বাবু। আমার কাছের কেউ নেই, যেদিন চিঠি থাকে না আমি দূরের মানুষের কাছে আসা দেখি। তাদের মুখের বিভিন্ন আলো ও অক্ষরের মধ্যে এক সাময়িক সুসময় আমাকে মূর্তির মতো বসিয়ে রাখে, বসিয়ে রাখে, বসিয়ে রাখে...........রাখে,

যেদিন চিঠি থাকে না।

জনপদবধূর ময়না

ছিল খাঁচাটির পাশে গার্হস্থ্য মটরদানা। জনপদবধূ
তার বদলে চাইল মানুষের ভাষা শিখে ময়না
প্রথম বলুক কৃষ্ণ, তারপর রাধা।
একদিন বনস্থলী-তাড়িত বাতাসে
হরিচন্দনের শাখা থেকে নিষ্পন্ন ডানায় উড়ে এসে পাখি
গা-ধোয়া সন্ধ্যার গন্ধ চিনতে পারে নি।
আজ ডানা ভুলে, পালকের স্বাভাবিক কালো সব
ঈশ্বরের চেয়ে উঁচু নক্ষত্রের লক্ষ্যে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে
রাত্রিকে কামিনীগভীর করে, সে শুধু চেয়ে থাকে
সিঁড়ি বেয়ে উঠে-আসা পাঞ্জাবি-গরদে বাবু কলকাতার দিকে; যেন ভাবে
মানুষের গৃহপালিত আকাশ কিছুক্ষণ খাঁচার বিশ্রাম শিখে যেতে পারে কিনা।
কিংবা কেউ, কোনও ব্যবহার্য রাধা, দম্পতিমূলক নীল আলো
ভালবাসার ভীষণ ভয়ে জ্বেলে দিতে গিয়ে
অকস্মাৎ তেপান্তর পেরুনো হাওয়ার মতো
হু-হু করে কেন অশ্রুতে যমুনা হয়ে ওঠে? পাখি, আমার একলা পাখি,
শুধু তুমি, তুমিই এসব কথা নির্ভয়ে জানতে পার; একা
বৃক্ষহীন শূন্যে ঝুলে-ঝুলে
শূন্যতা বিষয়ে আজ নিশ্চিত তোমার এক বক্তব্য হয়েছে।

এসে দাঁড়িয়েছে

পার্ক স্ট্রীটে এসে দাঁড়িয়েছে এক কিশোর ভিক্ষুক;
নোংরা, অশালীন জামাকাপড়ের উপরে
বয়ঃসন্ধির আগের রহস্যময় দুচোখ, নিয়নে
তার প্রার্থী চোখ উজ্জ্বল। সে মানুষ দেখছে, ছোট-বড় কাপড়ের
নিচে দেখছে মেয়ে-পুরুষ। শুনছে পানশালার দরজা ঠেলে
সন্তপ্ত বেরিয়ে আসা বাবুর পিছন-পিছন ছোটা
কপিলার কণ্ঠের শৃঙ্গার, অর্থাৎ গান
এবং টুং টাং পিয়ানো যা কিনা তার
গেঁয়ো নদীটির মতো।

ভিক্ষুকের আগে কিশোর শব্দটি মানায় না। অথচ আমাকে
পকেটের কনিষ্ঠ মুদ্রাটি তার বাড়ানো কৌটায়
দিতে গিয়ে দেখতে হল নোংরা কাপড়-জামার উপরে দুচোখ
অন্যমনস্ক, একদিকে হাত অন্যদিকে মাথা, সে তাকিয়ে দেখছে
তার সমানবয়স্ক এক টেডিবালককে,
মূর্তি যার উজ্জ্বল ধাতুর মতো, প্রোটিনের ব্যবহারে অতিরিক্ত উঁচু,
কিশোর তাকিয়ে ভাবছে—কি ভাবছিল? জানি না। কেবল
টংকৃত মুদ্রার শব্দে তাকিয়ে একবার
দেখল আমাকে;
আমি, অর্থাৎ পানশালায়-পানশালায় নদী খুঁজতে গিয়ে
বারবার হেরে-ফিরে-অসা এক কাঙাল প্রমত্ত।

দ্বিতীয় দশরথ

নামে সেও অযোধ্যার রাজা ;
ঋজু, সূর্যবংশীয় ললাট, যদিও শরীরে সমাপ্ত বয়স
তবু তার কাছে আজও বনানী প্রতিজ্ঞাবন্ধ; তাজা
জলের সরযূ-শব্দে পাঁচটি বৃক্ষের ছায়া ওষধির মতো
সংগোপন মিশে আছে তার অদ্রোহী রুধিরে—বুঝিবা সারস
মানুষের বয়োধর্মে বাজাবে খঞ্জনি
একা; নেবে প্রকৃতির তীর্থে, কৃতার্থ প্রতীকে, আমি শুধু শুনি
যা নয় সম্পূর্ণ গান, দেখি এখনও যা ছদ্মবেশ, ভাবতে চাই কেন বনে
প্রথম সন্তানকে না পাঠিয়ে সে নিজেই চলেছে নির্বাসনে,
লোকালয় থেকে দূরে বহু ডাল-ভাঙা-ক্রোশ ঘুরে
যেখানে এখনও পাখি আর জন্তুদের পৃথক পৃথক স্বাধীনতা,
আকাশ গোটানো নয় সপ্তকাণ্ড বাল্মীকি অক্ষরে।

এও দশরথ—দ্বিতীয়, অথচ অকৃতার্থ নামে
রথহীন, সময়ের বাঁধানো ফুটপাতে ম্লান পদরজে একা
অন্ধকার মুখ তার পিতৃত্বের অভিশাপে নত
কেননা আহত মায়াহরিণীর ভূলুণ্ঠিত শোণিতের স্মৃতি
তাকে শুধু সমাপ্তির দিকে দ্রুত টানে
এক ভালবাসার অগস্ত্য থেকে অন্য এক অদ্রি-অভিমানে;
জীবনও চায় না আর জনপদে বাঁচা

নামে, সেও অযোধ্যার রাজা।

ধর্ম, ধর্মান্তর

জেন-বৌদ্ধদের মতো 'প্রতীক্ষা' শব্দটি নিয়ে তুমি
হয়ে আছ তিব্বতীয়;—ডিডাং ডং ডিডাং ডং ঘণ্টাধ্বনির পাশেই
হাড় হিম করা সাইকেডেলিক। প্রায়ান্ধকারে
ভূমিস্পর্শহীন তথাগত,
তন্ত্রসার, উন্মার্গ গঞ্জিকা, হাসাহাসি, তবু
প্রতীক্ষার পা মাটিতেই
এবং সাফল্য একচক্কর ট্রায়ালেই হাঁপায়!

তুমি মন্দিরে বেড়াতে বেরিয়ে দেখেছ বাল্মীকি, ব্যাসকূট;
জেনেছ যা দ্রুত তাই শেষ ভাষ্যে অমর শাল্মলী-সিদ্ধি নয়,
নয় ফল্গু, বালির নিচের হিন্দু তর্পণ-সলিল;
আরাধনার মানেই তো আকাশের অভ্যাসে তাকিয়ে
জ্যোতিষ্কের নিসর্গ বেড়িয়ে মর্মে ফিরে-আসা। তারপর
একবার নারী হয়ে সন্ন্যাসীকে নগ্ন দেওয়া শেষ চিরবাস.
অন্যবার তুমিই পুরুষ, সমকামী, প্রতিষ্ঠিত একজন,
এ্যাকসিলেটরে ষাট মাইল চাপ দিতে গিয়েও
হঠাৎ ধ্যানের স্থাপত্য চেয়ে কাঁদা!
হয়তো এটাও পশ, শুধু পৌঁছনো যায় না।
তাই সুশিক্ষার ছলে
নিজের শিশুকে নিয়ে 'পৃ......থি.... .বী'র বানান শেখানো
এবং সন্ধ্যায় দেখা অনেক প্রসিদ্ধ ভূত তখনও তোমার
বাস্তুর শ্যাওড়া গাছে দুলছে, ভয় দেখাচ্ছে,
ধর্মের ওপরেই......যা ইচ্ছে করছে;
আর তুমি অপলক ব্রাহ্মণবোধিতে মেরুদণ্ড টান রেখে
দ্রুত বলে যাচ্ছ রামলক্ষ্মণ বুকেই আছে কি করবি আমায়?

ধর্ম থেকে ধর্মান্তরে এভাবেই বদলায় মানুষ।

খুব বেশি দিন আর

খুব বেশি দিন আর তোমাকে নিবিড় করে রাখব না কাছে;
যায়, ঝরে যায় বেলা, বৃক্ষশীর্ষে নিবে আসে রোদের স্বচ্ছতা,
তুমি শুয়ে থাক প্রেম শিউলিতলার ম্লান তৃণের শিশিরে
নীহারিকাপুঞ্জ বড় দূর থেকে আলো দেয় তৃষ্ণার তিমিরে
তাই ব্যথা।

সেই কবে একদিন পাখির ডাকের মতো অন্বেষণে আমি
বাইরে এসে দেখেছিলাম সমস্ত নীলিমা জুড়ে
তোমার প্রতিমা লেখা আছে
আজ দেখি কোনো ফুল নেই আর পুরনো বাগানে
খুব বেশি দিন আর তোমাকে পৃথিবী করে রাখবো না কাছে।

জবাব

কোনো দুঃখই যক্ষ নয়।
ফিরলে তাকে বলো
মেঘমণ্ডলকে ভাসিয়েছি তার পাখি;
সেই ডানা আজ ঘুরে বেড়ায়
নির্বাসনের নতুন পাড়ায়
শব্দ আর সাধে না আশ্রয়;
ফিরলে তাকে বলো
নিজের ছায়ায় শুয়েছে তার মানুষ
কিছুই ভাল লাগে নি যার
তবু যখন মূর্খ আঁধার
প্রশ্ন করেছিল
সে তখনই চিতার আলো
প্রদীপ করে তুলে নিল
শেষ নিশীথে জ্বালিয়ে দিল
সপ্তর্ষি, প্রধান কালপুরুষ।
ফুলের জন্য পাখির জন্য
রোজ সকালে নতুন সূর্য
উইল, রেখে গেল......

ফিরলে তাকে বলো।

সংজ্ঞা

থাকে না আচ্ছন্ন কিছু; উদ্ভিদ-উত্থান থেকে জাপানীপ্রথার
কুয়াশা ক্রমশ সরে যায়। ঘরবাড়ি, ঠাকুরদালান, সব
অনিবার্য হয়ে ওঠে জানালার কাঁচে,
লেখার বিষয় ছেড়ে উঠে পড়ে অস্থায়ী যুবক
বাতায়ন গরাদের রৌদ্রে হাত মেলে শাদা সমাধির মধ্যে
ভাবে, কে আসলে প্রবাসী এখন? সূর্যের অলক্ষ্য কারাগার
কোথায় ছড়িয়ে পড়ে সংজ্ঞার বাহিরে।

থাকে না আচ্ছন্ন কিছু, বাহাত্তর তেয়াত্তর করে ক্যালেণ্ডারের ভিতর
ক্রমে দুঃখও মেধাবী হয়ে ওঠে; ক্রমে
রঙের সিদ্ধান্ত নিয়ে সূর্যও চিন্তিত হয় নক্ষত্রবিশ্রামে।

রাজা (মার্টিন লুথার কিং স্মরণে)

গান্ধিজীর সময়েই আমাদের চোখের সমস্ত জল শুকিয়ে গিয়েছে।
এখন তোমার জন্য চোখ দিয়ে শুধু রক্ত পড়ছে রাজা। আমি
টেলিপ্রিণ্টার দূরত্বের এক কালো মানুষ, অসহ অনুতাপে
পুড়তে-পুড়তে, কিছু না করতে পারা
বোবা মানুষগুলোর পাশে আমার সতীর্থ মুখ
বারবার তুলে দেখছি তোমার অহেতুক অন্যায় নিদ্রার দুই পাশে
সারা আমেরিকার বাগান থেকে ফুল হয়ে উঠে আসছে প্রকৃতি।
কিন্তু তোমার বুকের উপর তো এই নানাবর্ণ
কুসুম সম্মিলনের কোনও প্রয়োজন
ছিল না! কেন-না তুমি সাদা আর কালো
দুই মূল বর্ণ কেবল মেশাতে চেয়েছিলে,
চেয়েছিলে মানুষের নিশ্বাসের সঙ্গে
এক পৃথিবীর নাগরিকতায় মানুষের বিশ্বাস মেলাতে।

এখন গভীর প্রশান্তিতে চোখ বুজে আছ বলে
দেখছ না কখন আকাশ আমাদের বিবর্ণ মুখের থেকেও
অনেক বেশি নীল হয়ে গেছে,
আর দু-চোখের থেকে বড় এবং গভীর দর্পণ নেই বলে
আমরা কেউ-ই কারো মুখে তাকাতে পারছি না। হায় ভালবাসা
মানুষের অভিধানে আর তোমার জন্য কোনো জায়গা রইল না।

মানচিত্র

পৃথিবীর মানচিত্র ভীষণ পুরনো হয়ে গেছে
এবার বদলানো দরকার,
ভূগোলের কথা আজকাল প্রকাশ্যে বলে না কেউ
বলে না পাহাড়, টিলা, নদী-বিভাজন
কোনও দেশ মানুষের বিশেষ সীমানা?
এখন কোন্ সে-ভাষায় লিখলে লেখা যায় মূল ভালবাসা
কোন্ ধৈবত ধ্বনিতে প্রত্যুষপ্রবণ পাখি তার
পালকের রৌদ্র পারে সূর্যকে ফিরিয়ে দিতে!
আসলে আকাশ এবং আদি আদিত্যপুরুষ ছাড়া
সবকিছুরই ইতিহাস এবার নতুন পদ্ধতিতে লেখা শুরু হবে!
ইঞ্জিনের প্রবল ইস্পাত সিগন্যাল না মেনেই
ভীষণ শ্মশান-দৌড়ে হয়তো মিলিয়ে দেবে উভয় গোলার্ধ।
মুছে-মুছে দুঃখ লেখার দুঃসাধ্য সাধনায় ক্রমে, ক্রমশই
কালো হবে যৌবনের টাটকা স্বাদু দিন!
একেকটা যুদ্ধের পর পৃথিবীর কিছু স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে-না-আনতেই
অকস্মাৎ শুনতে পাব রেডিয়োর হাড়-হিম গলা!

সুতরাং দেখা গেল কেউই সুখী নয়।
সুখ কি বুকের কোনও পদবী-হারানো দীর্ঘশ্বাস!
অক্ষরের অন্ধকারে কবির জন্মান্ধ চোখ, অথবা এখনও
গভীর বনের রক্তে সাহসী পাখির কিছু স্থায়ী প্রস্তাবনা।
তবু বনানীবিহ্বল মালা আজ আর নিকটে আসে না কেননা তারাও
মানুষের বুকের নিশ্বাসে এসে গড়ে উঠতে ভুলে গেছে,
চোখ অশ্রুপাত ছাড়া হারিয়েছে সমস্ত নিজস্ব ব্যবহার,
মানচিত্র সামলাতে পারছে না ভূমানুষ। পাগল মেজর জেনারেল
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁজছে নিজের মুখ!

তবু রক্তে মুছে-যাওয়া মানচিত্রের সীমানারেখার ঠিক ওপরেই
বারবার একলা এসে দাঁড়াচ্ছে কবিতা, যার শুরু
জানি, কিন্তু শেষ আজও সঠিক জানি না।

শুধু অন্যায্য সময়ে শুনেছি জেগে উঠছে বিস্ফোরণ
মিলনোন্মত্ত ঠোঁট থেকে খসে পড়ছে ঠোঁট,
নক্ষত্র সূর্যের নিচে ছোট, ছোট কেবলই
ছোট হয়ে আসছে একজন মানুষ ও মানুষীর সুসময়।

দাগ

এ-লেখা কবিতা নয়, এ-লেখা তোমার জন্য অভিধান-পালানো শব্দের
শেষ দাহকার্য থেকে উঠে আসা পুত্রেষ্টি যজ্ঞের চরু;
তুমি একে করতলে ধর্মের মতন স্থির রাখ, ওগো ম্লান উপবাসী
অন্তত ক্ষুধার জন্যও একটিবার চেয়ে দ্যাখো
জননী হবার আগে কত রুধির নিষ্ক্রান্ত লাল
ওই সব পূজারী অক্ষরে লেগে আছে।

একত্রিশে ডিসেম্বর : ঠিক রাত বারোটা

এ-সময় প্রতিবার ঠিকানা বদলায় সূর্য
এ-সময় প্রত্যেক জাহাজ
চন্দ্রাহত কুকুরের মতো চিৎকার করে ওঠে
অগভীর গঙ্গা থেকে বারোটা রাত্তিরে।
প্রায় সপ্তর্ষি-সমান উঁচু শীতার্ত শূন্যতা থেকে
এ-সময় নেমে আসে অসম্ভব গর্বিত কুয়াশা!
মানুষের কথা, কাজ, অভিবাদন থেমে থাকে আসন্ন ভোরের
প্রথম ফুলের কাছে। মনে হয় আছে
এই দুঃখী নগরীর রক্তে কিছু শব্দ বাকী আছে,
যে-সব শব্দের সাধ্যে আজো জড়ো হতে পারে কিছু
অচেনা উপমা
যারা কলকাতার প্রতিটি রাস্তায়, মোড়ে
হাঁটু গেড়ে বসা ঈশ্বরকে ক্ষমা করে দিতে পারে.
যে-ঈশ্বর উদাসীন, দীর্ঘদিন বিশেষ নিষ্ঠুর
নগরীর প্রতিটি উৎসব, শোক, শুদ্ধির সংকটে,
তবু রাত বারোটার কলকাতা চিরকাল কবির কলকাতা
তখন মানুষ অবিশ্বাস্য নিসর্গের যোগ্য হয়ে ওঠে!

কাল্লু মিয়ার দুঃখ

মানমন্দিরের পাশে পাপী বসে আছে।
তার ইচ্ছা—হোক ভয়ংকর ঝড়,
প্রাকৃতিক পুনর্বিবেচনার সুযোগে
যাতে সে লুণ্ঠন করে নিতে পারে
ভিত উপড়ে-যাওয়া একাকার মানুষের অধিকার থেকে
তোরঙ্গে লুকানো নোট, গহনার বাক্স
আর স্থায়ী হার্দ্য রমণীদের আবক্ষ নিটোল উপঢৌকন।
বহুবার রাত্রিকে রমণে, চৌর্যে, মৃত্যু-প্রণয়নে
ব্যবহার করা যাবে ভেবে সে তার লোলুপ চাক্কু, সিঁদকাটি,
অমাবস্যা নিয়ে পৃথিবীর পথে পথে
পরদ্রব্য খোঁজ করেছিল। কিন্তু শালার পুলিশ (মিয়ার নিজস্ব ভাষা)
বারবার মাটি ফুঁড়ে তার সামনে এসে তাকে জেল শাসিয়েছে।
তাই সে নগর ছেড়ে সংকুল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে
মানমন্দিরের পাশে
একা, বাঙালী চাষীর মতো আকাশে তাকিয়ে—ঝড়
দৈব দুর্যোগের জন্য ধরনা দিয়ে বসে আছে পাপী।
আল্লা আবহাওয়ার ঠিক-ঠিক পূর্বাভাস দিলেই কেবল
কাল্লু মিয়া নেমে যাবে সমতল মানুষের কাছে।
ঝড়ের পরের পৃথিবীকে
অকুণ্ঠ লুণ্ঠনে দাগী করে যেতে, দামী করে যেতে
তার বড় বেদনার সাধ।

আমি

বল, কোন্ ত্রুটি ছিল অতিথিসৎকারে।
আমি তো বুকের বাঁ দিক ইন্ডিয়া গেটের মতন
খুলে দাঁড়িয়েছিলাম, ওখানে হৃদয় থাকে, ওখানে নিশ্বাসে
ভারতবর্ষের আবহাওয়া স্পষ্ট হয়। আমি
গর্ভের ভিতর দশমাস এবং বাইরে—একুনে একত্রিশ বছর আমার
জন্মের কারণ খুঁজে বেড়ালাম,
ক্ষুধায় পেলাম অন্ন, খুব বেশি খুশি হলে কলকাতার অন্ধকার কাঁপিয়ে
প্রচণ্ড হাসলাম;
নদীর সামনে ভুল কবিতার জন্য কাঁদতে গিয়ে মনে হল
সে খামোকা কয়েকটি কুটুম নক্ষত্র তার গতি
বোঝাবার জন্য ঊর্ধ্বে স্থির টাঙিয়ে রেখেছে—যারা
ছন্দের আদেশ না পেলে নিকটে আসে নি
এখনও প্রায়ই আমি তাদের প্রিয়ার চোখ হতে
বলি। বছরের পর বছর তাদের জন্য প্রাণপণ কিছু,
নতুন উপমা স্মাগ্‌ল করার চেষ্টায় এলার্ট থাকতে হয়।
আমি প্রকৃতির কাছ থেকে
মানুষের কাছে গিয়ে প্রেমের বদলে চেয়েছিলাম শান্তিই।

কিন্তু আজ আমায় কিছুই মানাচ্ছে না; দেখ
করতলে চাপ চাপ রক্ত অথচ কেউই হত্যাকারী বলছে না,
মাথা থেকে পা অবধি এত
কাহন কাহন ভালোবাসা অথচ প্রেমিক নই।
আজও পাগলের মতো বছর-বছর ভারতবর্ষের অন্ধকার এবং
রৌদ্রের সটীক ইতিহাস বা ভূগোল
আমার বিগত জন্ম, মৃত্যু, কিংবা প্রাদেশিক প্রাণ আছে কিনা খুঁজতে যাই।
(এইখানে লক্ষ করুন যে "আমি" বা "আমার" প্রায় সমার্থক শব্দদ্বয়
এ-কবিতায় প্রায়ই ব্যবহৃত হচ্ছে;) হয়তো এ-কারণেই আমি
পাশে যথেষ্ট জায়গা থাকলেও কাউকে পারি নি বসতে দিতে।
আমার বিশ্বাস নেই, সততা সংশয়াপন্ন, তবু
কী করে যে শব্দগুলি সং সাজতে আসে!

আমি কুকুরের মতো তাদের তাড়িয়ে দিয়ে দ্রুত
দরজা বন্ধ রাখবার পরেও দেখেছি তারা ক্ষুধায় বা যৌনকাতরতায় পালিয়ে
না গিয়ে, তখনো প্রভুভক্তির তাড়নে
বাইরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে, তাদের
ভগবান নাকি আমি, কিন্তু আমার তো নিজেরই কোনও ভগবান নেই।
খুঁজে দেখি ভেবে মন্দিরের ভিতরে গিয়েও শুনলাম
ঘণ্টাধ্বনি মানুষকে পাপপুণ্যে শেখাচ্ছে, আমার
ভক্তি নেই দেখে ভীষণ বিরক্ত পুরোহিত
প্রায় গলাধাক্কা দিয়ে হরিজনের সমান বের করে দিলেও কেবল
গান্ধীজির জন্য তাকে বলি নি কিছুই;
তিনি অহিংসা ও শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট শিখিয়ে গেছেন।
কিন্তু দু-পাঁচটা ফাল্গুন ধর্মঘট করে কাটিয়ে দেবার পরেও যখন ঈশ্বর
বাইরে এলেন না, তখন বিজ্ঞান
অর্থাৎ চরকার দিক থেকে এটমের দিকে
শরীরের প্রায় ছফুট উচ্চতা নিয়ে দৌড়ে গিয়েছিলাম।
অথচ ক্রমেই ছায়া বড় হল, ক্রমশই মনে হল শরীরের কোন স্বাদ নেই,
বারুদ ফুরিয়ে গেছে বলে চুম্বনও স্পার্কহীন।
আজ বারবার মনে পড়ছে স্পেনের অদ্ভুত সেই মানুষটির কথাই
পৃথিবীতে যে-নাকি প্রথম হাইড্রোজেন বোমাকে
"কিরে, ঈশ্বরের কাছে হেরে গেলি?"—এমন ভঙ্গিতে
নিজেরই অজান্তে লাথি মেরে, ফিরে এসে
দুধের সমান স্বাদু আত্মজাত শিশুটিকে চুম্বন করেছিল; যে
বোমাগুলি সংঘর্ষের পর নেমে মাটিতে পড়েও
ধ্বংসে ফাটল না; তাদের মিলিত এটমপুঞ্জের শোক যেন
মানুষটির ক্রমশ মৃত্যু-অপেক্ষার মধ্যে আজও
আমাদের অপরাধী হতে ডাকে। জানি না শিশুটি
যৌবনে পৌঁছুবে কিনা; পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম স্তবে কোনদিন
ভবিষ্যতে পৃথিবীর অটোমেশান শাসিত নরকে মনুষ্যত্বের ওপর একাকী
পতাকার দৈর্ঘ্যে দাঁড়িয়ে, বুঝবে কিনা সন্ত ভোরের বাতাস
কেন ভিন্ন হতে চেয়েছিল পাখির সাহসে। হয়তো সেদিন
সূর্যের লাইব্রেরী থেকে শত-শত কবিদের কবিতার পুনর্জন্মগুলি
শেখাবে শুদ্ধির গান, শেখাবে রমণী।
আমি থাকব না সেদিন, এখনও কি আছি? একে কি

বাঁচা বলে, শব্দকে ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে, নারীকে
ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে
দু-পংক্তি বেদনা লেখা,
তাও সেই একই পয়ার অথবা ব্যস্ত পাঁচ-মাত্রা ছ-মাত্রা!
বুকে বড় মাত্রাহীন নিশ্বাস এখনও
ফুরোয় না, কিছুতেই যেন ফুরোতে চায় না; মরে গেলে কেউ
কাঁদবার আছে কিনা সঠিক জানি না
নাহলে আত্মহত্যাও করে দেখা যেত দুঃখকে বাঁচানো যায় কি না।
আসলে কিছুই আর করার নেই বলে শেষ
খুলে দিয়েছিলাম ইণ্ডিয়াগেটের মতন
ফুসফুসের যমজ জানালা; হে অতিথি জীবন,
বল কোন্ ত্রুটি ছিল তোমার সৎকারে?

ঠিকানা

অন্যের বাড়ির সামনে ট্যাক্‌সি থেকে মধ্যরাতে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বললে,
"বাড়ি যাও রাত হয়েছে।"

দেয়ালে তেত্রিশ নম্বর;

কিন্তু আমার তো অত নম্বর নয়!
আমি একজন হয়ে বেরুই, দুজন হয়ে ফিরি:
স্বর্গ, মর্ত, পাতাল ফুসফুসের মধ্যে হুড়মুড় ঢুকে গেলে
ভালবাসা রেফিউজির মতন এককোণে সরে যায়;
আমি আমাকে অনেক কষ্টে শরীরে জোগাড় করে
দোভাষী দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলি "চিচিং ফাক", আর
নিজের নিয়তি খুলে যায়,

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এসে বলেন, "সমর এলি?

আমি যে কখন থেকে তোর জন্যে বসে আছি। এত রাত করতে হয় রে?"
খুবই লজ্জিত এবং বিনীত গলায় বলি, "একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।"
তিনি তৎক্ষণাৎ, "তুইতো তোর শরীরেও বেড়াতেই এসেছিস, বেড়ানোই জীবন

তা বলে এতটা রাত করতে হয়!

এত রাতে যে সপ্তর্ষিমণ্ডলীর ঋষিরাও জাগতে পারেন না।"
তারপর গুরুদেব, আমার অনিদ্র একমাত্র মানুষ-দেবতা, মাথার ওপরে
হাত রাখলে আমি শিশুর সমান কেঁদে উঠে প্রত্যেক রাত্রির মতন আরেকবার
আন্তরিক আর্দ্র অজুহাতে বলে উঠি,
"আপনি রোজই কেন এত কষ্ট করে জেগে বসে থাকেন;

আমি যে গৃহপ্রত্যাবর্তনের পথ

ঈশ্বরের ভয়ে আর চিনতে চাই না।"

নীলজবা

হয়তো পায়ের কাছে জায়গা ছিল না!
ছিল না স্বচ্ছন্দ সূর্য, স্নাতকমন্ত্রের
জ্যেষ্ঠধ্বনি; তাই কোনো সাজানো বাগান
তোমাকে শিশুর মতো অট্টরোল লাল
করে পাঠাতে পারে নি মন্দিরে। পূজারী
ধূপের বেদনা নিয়ে একাকী বসেছে।
নীলজবা, তুমি কার অত্যাচারে নীল?
অথবা দর্পণ হতে গিয়ে —অকস্মাৎ
আকাশের রঙটুকু আটকে রেখেছ!
তাই পূজা হয়ে ওঠা হল না তোমার,
হল না শৈশবসাধ্যে ভক্তির পা বেয়ে
আলিঙ্গনে উঠে গিয়ে জাগানো জননী।
কেন-না মালায় কোনও ফুলের বসতি নেই
আছে যুদ্ধ-অপরাধী কাটা-মুণ্ডু; যারা
মৃত্যুর পরেও দিব্য চোখ মেলে আছে
অথচ কিছুই দেখছে না। দেবীদেহ
শিখে তারা শূন্যমেধা স্থির হয়ে গেছে।

শ্মশান এসেও

ঠাকুরদালানে শুয়ে আছে কার শব?
ও কি পুরোহিত, ক্ষুধাবোধহীন
সংসারী ঈশ্বর।

পাশেই বাগানে ডেকে ওঠে শেষ টিয়া;
মানুষের পাশে
বেড়াতে এসে সে
দেখে গেল মন্দিরে
কী করে দরজা প্রবেশে হঠাৎ
খাঁচা হয়ে থেমে যায়।
ফুল পুড়ে চলে মালা হয়ে বুকে, তবু
শ্মশান এসেও মানুষকে আর
বের করে নিতে পারে না।

উত্তরায়ণ

সেবার উত্তরায়ণে রাজধানী ভরে উঠেছিল
প্রাদেশিক মানুষের স্বেচ্ছাসম্মেলনে;
সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাষা, খাদ্যের অভ্যাস, ধর্ম থেকে ফিরে এসে
ভীষণ সরবে ডাকা—ইত্যাদি সংক্রমে
ক্রমে জড়ো হয়েছিল এক সুমহান বক্তৃতাপদ্ধতি; দেশ
ঘাসের উপর গালে হাত দিয়ে বসে শুনেছিল
যমুনার কল্লোল ছাপিয়ে এক বিশেষ স্বাধীন কণ্ঠ।
এক খঞ্জ, চার ফুট খাটো
বক্তার উদ্‌বায়ী মুখ ভালো দেখতে না পেয়ে
বলেছিল, "আপনারা আমাকে কেউ তুলে ধরবেন?
আমি বক্তৃতার সত্তম ভাষার সঙ্গে
বক্তার মুখের রৌদ্র মিলিয়ে দেখতে চাই।"—কিন্তু
কেউ তাকে মুখ দেখতে দেয় নি সেদিন,
বক্তৃতা কি দেখার বিষয়! সেবার
রাজধানীর উত্তরায়ণে ভারত, ভারতবর্ষ
প্রভেদের মধ্যে ঐক্য নিয়ে ঘাসে বসেছিল। মোগল দুর্গের
প্রাচীন কামান থেকে শোনা গিয়েছিল তূর্যনাদ;
দিল্লীর ঈশ্বর, খোদাতাল্লা, যেশাস,
তখন তাকিয়েছিলেন অন্য দিকে।

উত্তাপ

মনে হয় এবারের শীতকালেও আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।
দু-হাতে দস্তানা, কোট-কম্ফর্টার নিয়ে প্রভাত-ভ্রমণে বেরিয়ে দেখব
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের কাছে শুষ্ক নেমে আসছে বৃক্ষের বিষণ্ণ পাতা;
দেখব পৌষের সমাকুল কুয়াশায় বাড়ির নম্বরগুলি
স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে স্তব্ধ মহিষের মতো হয়ে আছে।
মনে হয় এবার শীতেও আমার গরম জল
লাগবে; সূর্যকে মাথার উপর অক্ষরের খড়্গো
লম্ব হতে দেখলে ইজিচেয়ারের নিখুঁত আলস্যে
পুনর্বার গত বছরের কবিতায় চোখ বোলাব, যেখানে
অসংখ্যবার লেখার পরেও 'মানুষ' শব্দের ব্যবহার সঠিক হয় নি;
আয়ুর সমান তোমাকে বর্ণনা করতে চেয়েও যেখানে পৃথিবী থেকে
আমি কোনো নতুন নিঃশ্বাস পাই নি। এখন তাই
আমার ভাষায় বড় শ্মশানের শোচনা; দুপুরে
শরীর ও ছায়া যখন নীরব প্রতিদ্বন্দ্বী, যখন কেবল
কাক ছাড়া অন্য কোন পাখি স্বেচ্ছাসেবকের মতো
তার আপাদমস্তক কালো নিয়ে খুব কাছে আসতে চায় না,
আমি রৌদ্রকে বুঝিয়ে বলি কেন ভালোবাসা আজ আর খাদ্যবস্তু নয়!
বলি, কেন এখন বুকের পাশে অসম্ভব খোলা
কবিতার খাতার উপর উঠে এসে পড়ছে শুকনো পাতা,
উপমাক্রান্ত ইন্দ্রিয়সমষ্টির মতো যারা হাল্কা, ভাষণবিহীন।
তাই বাঁ হাতে কেবলই তাদের সরিয়ে দিচ্ছি, কেন-না এখনও
ডান হাতে আমার ঝর্ণা কলম—যার অর্থ হল
এবারের শীতকালেও আমাকে শব্দ থেকে তাপ এনে বেঁচে থাকতে হবে।

ময়নাঝুরির ডাকবাংলোয়

বাংলোয় ঢুকেই ক'টি খালি চেয়ার দেখতে পাই;
মানুষের শূন্যস্থান চোখে পড়ে এই নদীমাতৃক কুঞ্জের আঙিনায়।
বেড়াতে এসেছি আমরা ক-জন বন্ধু কলকাতার নগর ঘর্ঘর থেকে
ঋজু, লম্বা শাল, শিশু, মহুয়ার জঙ্গলমহালে
সেদ্ধ ডিম, মাখনরুটির ভোঁতা ছুরি, বাইকোলেটস্ নিয়ে
বেড়াতে এসেছি।

যদি রাতে আলো ওঠে, বঁড়শীর মতো
বাঁকা জ্যোৎস্নায় আটকে যায় বৃক্ষের বল্কল, মনে হতে থাকে
নদী কেবলই এগিয়ে আসছে, মহুয়া ও সঙ্গে আনা
বাবু আসক্তির ভিতরধমনী মেলামেশার পরে হয়তো তখন
নিজের ঊরুর হাড়ে সৃষ্টি করে নিতে হবে নারী!
আকাশের নিচ থেকে ঘরে তুলে-আনা সমষ্টি চেয়ারে
প্যান্ট-জামা আলগা করে উদাসীন বসব, একলা।

না, আমরা কলকাতায় কোনদিন গঙ্গাতীরে বেড়াতে যাই না।
জানি নি, এখন কেন সে-রকম জাহাজ আসে না!
দেখি নি চৌরঙ্গি ট্রামগুমটির পাশে দর্পী নাগকেশরের
শিবায়ন! তবু আশ্বিন রাজার ঋতু,
আমরাও রাজার মতো জয়ে বেরিয়েছি,
শুধু যুদ্ধ নেই, নেই তিলক-পরানো অশ্ব,
আমরা খুঁজতে বেরিয়েছি আয়নার ভাঙা টুকরো
আমরা ভীষণ ফুর্তি করতে বেরিয়ে
এখন বাঘের ভয়ে শূন্য পড়ে থাকা উঠোন-চেয়ার
ঘরের ভিতর এনে শেষবার বন্ধ করে দিয়েছি দরজা;
নক্ষত্র নেবার আগে, হাজার পাখির ধিক্কারেও আর খিল খুলব না।

ম্যাজিক

মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ :
ভাল করে দেখুন আমার দুহাতে কী?
ইস্কাবন, রুহিতন, চিড়িতন আর......না না হরতন নয়
[হরতন মানেই বয়সদোষ, ভালবাসাবাসির শরিক]
ওটা আমার নিজেরই বড় প্রিয় মুণ্ডু—টেরাকোটা।
নাক বা কানে মানুষই, শুধুমাত্র দুচোখ মানুষ
হতে গিয়েও হঠাৎ মধ্যপথে মূর্তি হয়ে আছে

এবার লাগান তালি ওয়ান, টু,—থ্রির আগেই দেখুন
মুণ্ডু আমি উড়িয়ে দিলাম
আপনাদের জ্যান্ত চোখের মধ্যেই ছড়িয়ে নিলাম,
নিয়ে, স্কন্ধকাটা আমি ভূত, বা ভবিষ্যত? ভাবতে গিয়েই—বাব্বাবা
শুনি আমারই হাতের এতদিনকার
ইস্কাবন
        রুহিতন
                চিড়িতন
ধর্মযাজকের বেশে স্টেজে সব দাঁড়িয়ে রয়েছে।

উপাখ্যান

সাবিত্রী! তোমাকে দেখলাম কাল বহুদিন পরে।
সূর্য সবেমাত্র শেষ, চৌরঙ্গির অন্ধকারে
জীবনবীমার ঘড়ি জ্বলে ওঠে নি তখনও,
দেশী মানুষের হাতে অনেক বিদেশ ঘুরে
ফিরে-আসা জাহাজের গোপন সম্ভার, দেখলে মনে হয়
বড় সুসময়! তুমি দুচোখে ভ্রমর নিয়ে
একা, একা নও একাকিনী, অন্যমনস্ক দাঁড়িয়েছিলে
কিন্তু দেখছিলে না কিছুই! (প্রথমে লিখলাম 'একা'
তারপর ওই নিঃসঙ্গ শব্দকে না-কেটেই লিখলাম
'একাকিনী'। কেন না আমার মনে হল তুমি নির্বাসিত, শুধু
জনকনন্দিনী নও, রাক্ষস শহর তোমাকে প্রকাশ্যে
দাঁড় করিয়ে রেখেছে সূর্যের নিবন্ত অবেলায়!')

কবে, কতদিন আগে এই চোখ থেমেছিল তোমার দু-চোখে,
হাত ছুঁয়েছিল আষাঢ়মেঘের মতো আর্দ্র কেশপাশ, শুধু
শরীর ছোঁয় নি, কেন-না তখন অকালবর্ষণে বড় ভয়
মনে হত শস্য নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি ধাক্কা দিয়েছিলে
যেমন ঝড়ের আগে ধাক্কা মারে ঈশান বাতাস,
বাসাবাড়ি কেঁপে ওঠে, দরজা জানলা শাস্তিতে সন্ত্রস্ত হয়,
তুমি গোপন মণির মতো আমার অক্ষর নিয়ে তেমনই মাতাল
সহমরণের শাস্তি দিতে চেয়ে খুলে দেখিয়েছিলে তাজমহল
অমন সমাধি ঊরু, ভাঁজে উড়ে এসে বসেছিল
হাজার মৌমাছি, তুমি দুষ্টু বালিকার ফুল ছেঁড়ার সমান হিংসায়
ওষ্ঠ থেকে ছিঁড়ে নিয়েছিলে প্রথম পুরুষ ভাষা;
চিৎকার করে বলেছিলাম, 'সাবিত্রী ওখানে শরীর নেই
কোন সত্যবান কবিতার সম্ভাব্য শরীর।'

সেই দিন থেকে আমি বন্দী, সেই থেকে আমি অসম্পূর্ণ
যবন মহিষ ছত্রাকার মাংস ধ্বংস করে কেবলই ভেবেছি
মৃত্যু মানেই পুনর্জন্ম, তবু বুকে ফিরিয়ে আনতে পারি নি ভাষাকে!
সাবিত্রী, সব নদী সাগরে যায় না, সব পাথর

আকাশের বিরুদ্ধ উত্থানে হিমালয় হয়ে উঠে
সূর্যকে থামিয়ে শেষ জিজ্ঞাসা করে না
বল, পৃথিবী কেমন দেখলে ?

সন্ধ্যার কলকাতা বড় প্রতারক, নক্ষত্রের নিচে সে-সময়
জ্বলে ওঠে চতুর নিয়ন, জীবনবীমার ঘড়ি
নতুন শিশুর মনো নিজস্ব চীৎকার করে জননীসন্ধানী ?
সাবিত্রী, নিশ্বাস একবারই শরীরের দুঃখ থেকে মুক্তি পায়
তখন নারী ও পুরুষচিহ্নের হাড়-মাংস পড়ে থাকে, তাই
তোমাকে ভিড়ের মধ্যে ডাকি নি, তোমাকে পুরুষ চিলের মতো
ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে বলি নি এবার শরীরের নিচে এসে
মুক্তি দিয়ে যাও, আমার সমস্ত কবিতার পক্ষপাত
পুড়ে ছারখার হয়ে যাক শ্মশান উৎসবে।

সাবিত্রী! তোমাকে দেখলাম কাল, একা,
একা নও, একাকিনী,
বহুদিন পর।

তেমন স্বতন্ত্র হলে

তেমন স্বতন্ত্র হলে নিতে পারি তোমাকে এখনও।
খালি পড়ে আছে ব্যবধানভরা ওই মৌলিক আসন
নিচে যার ভারতীয় মাটি কিন্তু মাথার উপরে যে-আকাশ
তার কোনও নামকরণ এখনও করি নি; এ-তো ভালবাসা নয়
এ-তো নয় শরীরের সনির্বন্ধ স্ফীতি
এ-আমার নতুন প্রার্থনা, লৌকিক থেকেই পায়ে হেঁটে-হেঁটে
বাস্তবিক পেঁছে যাওয়া অলৌকিক কথোপকথনে।

তেমন স্বতন্ত্র হলে নিতে পারি তোমাকে এখনও
মুচড়ে প্রচণ্ড টানে অদেখা শিকড়ে অভিমানে!
একটি আসন আমি রেখেছি ভীষণ সংগোপন,
তুমি এসে বস, এক সৃজনপিপাসু
চোখ স্পর্শ কর; যেন সে এবার চোখ বন্ধ করে দ্যাখে
মৃত্যুর আগামী শিল্প; অক্ষর কাকের মতো ঠুকরে ঠুকরে
সর্বাঙ্গ খেয়েছে; আছে যা এখনও বাকী
তার নাম কবির কঙ্কাল!
মানুষের থেকে তাঁর হাড়ের শুভ্রতা কিছু বেশী।

বিশ্রাম

সমরের মুখ জুড়ে নেমে আসে শীত।
এই অপরাহ্ণ বেলা গ্রামীণ গোরুর কণ্ঠে ঘুণ্টি বেজে ওঠে,
মানুষ রাখাল তার নিজস্ব জন্তুকে নেয় ফিরিয়ে গোয়ালে।
সমর কী যেন ভাবে, তার মুখ বড় ধার্মিক দেখায়,
সে কি হীনযানে ফিরে যাবে, দাম্পত্যচর্চার আগে
খাবে বাছুরবঞ্চিত দুধ? জানলার খোলা নীলে
গুনে দেখবে সপ্তর্ষিমণ্ডলে কোনও ঋষি বাড়ল কিনা?
মনে পড়ে, একবার তাড়া-খাওয়া হরিণের মতো
বাংলার জড়ো সুবাতাস এসে ঘরে ঢুকেছিল!
মায়ের বিধবা ফোটো দুলে উঠল, মশারি মশার মতো ছিটকে
গেল নৈঋর্তে উড়ে, তবু ঘর থেকে অন্ধকার
একটুও নড়ে নি। কেবল অযত্নে রাখা কয়েকটি বইয়ের শেষ দুঃস্থ পাতা
অবিরল উড়েছিল ঘরে; অক্ষরে-অক্ষরে সে যে কী ভীষণ রেষারেষি!
অথচ সফল ভোরে সকলেই গিয়েছিল ফিরে
পুস্তকের প্রাচীন আকারে। আজ তাই
বয়স নিতান্ত ভীরু, সমরের মুখ ঘিরে ঘন হয় পৌষ,
ভালবাসা কথা বলে নিরুত্তাপ নার্সের ভাষায়,
বলে "চুপচাপ শুয়ে সুস্থ থাক, দুধ খাও, শব্দ লেখ কম।"

বাকি যা ছিল তোমার

শাকসবজির পাশে ফ্রীজ; ওই তোমার নির্বাচিত মুখচ্ছবির রমণী
যে এখন প্রতিটি খাদ্যকে শর্করাবিহীন করে রাখে।
একটি জানালা খোলা, মাথার উপরে বিদ্যুৎবিনীত বায়ু,
তারই ফাঁকে ভালবাসা আসে যায়, খাদ্যতালিকার সঙ্গে কিছু
মেলামেশা করে।

আমার ভূগোল ছিল আহারের আশেপাশে, আমার ক্ষুধার রব
শোনা যেত প্রতি শস্যকণায়, আমিই কুড়িয়েছি নানান প্রদেশে
শরীরের ছন্দ, অন্ধকার: এখনো স্পষ্ট বেঁচে আছি ভালবাসার পিছন দৌড়ে।
সংরক্ষণহীন এই জন্মে ছেনেছি আসল নদী, দৈব গাছপালা,
মহান পাহাড় থেকে স্বাভাবিক তুষার চিনেছি—সে তো আমারই ক্ষুধার
প্রাক্তন স্বদেশ। আজ তুমি কোথায় এনেছ ছায়া, থামিয়েছ আমাকে ওই
নিয়ন্ত্রিত শীতমেশিনের পাশে। দূরে বসে থাকা
পুরুষ বেড়াল আমাকে গভীর লক্ষ করে, সারারাত একাকী বেড়িয়ে
আর স্বাস্থ্য ব্যবহার করে এখন সে বসে আছে সকালকে চেপে ধরে
হাতের থাবায়,

আমার আঁধার সেও কিছু জানে, বাকি যা তোমার ছিল
তুমি তার নামকরণ কর নি কখনও।

সরল প্রাণী

[মানুষের মতো এমন সরল প্রাণী আর নেই।
সেই প্রথম বিশ্বাস করেছে ঈশ্বর আছেন।
হাজার মন্দির ঘুরে এসেও একটু জাগালেই সে এখনও
যুদ্ধে চলে যায়, রক্তের শ্রাবণে মাতে।
বুদ্ধ মানুষকে বুঝিয়েছিলেন—তারা বুঝেছিল,
যীশু মানুষকে শোনালেন—তারা চুপচাপ শুনল,
হিটলার হাতে অন্যায্য আয়ুধ, পাপী পরমাণু
তুলে দিলেন—প্রতিবিম্ব মানুষকেই মারল।
তারপর একদিন হাসি-হাসি মুখে রাষ্ট্রসঙ্ঘে
দেশের বাঁধানো নাম সামনে নিয়ে গদিতে বসল মানুষ,
কিন্তু এক গ্লাস জল খেতে-না-খেতেই শুনল
ভাই ভাইকে মারছে, সঙ্ঘ বললেন, "দেখছি"। শকুনক্রান্তিতে
ভরে গেল বৈদূর্য আকাশ—সঙ্ঘ বললেন, "দেখেছি"।
আমি দার্শনিক বিশ্ববাবুকে জিজ্ঞেস করলাম,
তিনি বললেন, "তাইতো......।"]

যান গঙ্গাতীরে দেখবেন অজস্র ভালবাসার ভিড়ে ভরে আছে তীর!
ছোট সংস্করণ সরোবরে যান দেখবেন বেণ্ডবুড়োদের সামনে
হাতে হাত দিয়ে নিঃশঙ্ক হাঁটছে টাটকা যুবা ও উন্মুক্ত নাভির সাহসিকা!
এরই মধ্যে কেউ নক্ষত্রে তাকাচ্ছে, কেউ বলছে এবার বৃষ্টির পরে
ময়দান বড় সবুজ; কেউ বা বিস্মিত—মাটির এক জায়গায় শিকড়ের মতো
স্থির দাঁড়িয়ে ভাবছে, "এখানে নিশ্চয় কোনো গাছ ছিল।"
পার্কে, রেস্তোরাঁয়, শহরের যে-কোনও আঁধারে সুযোগ পেলেই
দম্পতি হয়ে উঠছে শরীর। ডেটলের গন্ধ, রাবারগ্লাভস্ খোলার শব্দ এসে
কেবলই আক্রমণ করছে বাবু কবিতাকে
অক্ষরগুলি সাদা শীর্ণ হতে-হতে বেরিয়ে পড়ছে কঙ্কাল
তারা মানুষের দরজা-জানালা আক্রমণ করছে,
বাথরুমের কল থেকে আর জল পড়ছে না
সময় পালাচ্ছে তবু ক্যালেন্ডারের পাতা ছেঁড়া হয় নি, কারণ
মানুষের মতো এমন সরল প্রাণী আর নেই,

সে এখনও বিশ্বাসপ্রবণ, এখনও সে পেঁপে ও শসা, নিটোল বেগুন
কিনে আনে বৌ-এর জন্য। বিপ্লবীর স্ত্রী করে লক্ষ্মী পূজা;
মন্ত্রীর পরিবার রবিবার হাত দেখায় হরিশ আচার্যকে!
মানুষ ভাগ্যের হাতে থাপ্পড় খায়, কদাচিৎ বিরল চুম্বনও,
তারপর শেষবার বৃক্ষের শুকনো হাড়ে আগুন জ্বালিয়ে
সৎ বোকার মতন নিজেকে পোড়ায় সরল মানুষ।

সন্ধান

আমি গাছটিকে খুঁজি, গাছটিও খুঁজেছে আমায়।
এই অসাধ্যসাধন খোঁজা কেউ টের পেতে পারে ভেবে আমি
আজকাল খুব সাবধান হয়েছি; একদিন একা
কিশোরের চোখের জলের নৌকায় যে এসেছিল
সে এখন জাহাজ শিখেছে;
মাল্লার কণ্ঠের পাশে হঠাৎ বাষ্পীয় ভোঁ
শেখাল, কীভাবে বিদায়ের আগে মানুষের
শব্দ নষ্ট করে দিতে হয় যান্ত্রিক উদ্যোগে!
এরা কিন্তু স্থিতি চায়, এরা কিন্তু পৌঁছে যাবে
লক্ষ কিলোমিটার জলের ওপারে
কোনও নারী-অধ্যুষিত উল্লোল বন্দরে। আমি
সর্বদা সন্দিগ্ধ থাকি, কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যবর্তী গূঢ় অন্ধকারে
চ্ছলাৎ চ্ছল শব্দ বসাই। দিনে দীর্ঘ ছায়া পড়ে
তাই রাত আমার অবিঘ্ন চারণভূমি;
আমি ছায়াহীন, পশ্চাদ্ধাবনহীন,
পৌঁছুতে চাই না কোনও ত্রাণে; একা
ঢুকে পড়ি জন্তুর সঙ্কুল বনে, পশুর অত্যন্ত কাছে খুঁজি
নিসর্গ সেনানী, খুঁজি
আমার সাধ্যের গাছ, এ-প্রকার সেও বহু খুঁজেছে আমাকে।

রুনু চলে গেছে

রুনু চলে গেছে; শরীরের মাপ তার
নির্বিকার
ঝুলে আছে ফেলে যাওয়া পুরনো জামায়।
কাল কাকভোরে
যখন সূর্যের মুখে লেগেছে আগুন,
যখন এ-কলকাতার প্রতিটি উদ্‌বৃত্ত গাছে
শিকড়ের কাছে
ক্রমে উঠছিল ছায়া
রুনু রুনু রুনু
স্বদেশী শরীর নিয়ে এক-ঘুম থেকে উঠে
আবার শুয়েছে একা ফুটপাথের শীতে।

বড় রাস্তার মানুষ তারপর ঢুকেছে গলিতে
গলির আকাশ
চৌমাথার বাইরে এসে অকস্মাৎ ট্রাফিকের লালে
থমকে দাঁড়িয়ে ম্লান দেয়ালে-দেয়ালে
পড়ে গেছে তের নদী ওপারের ভাষা,
ভেবেছে, এবার শৃঙ্খলা তবে
কোন্ পথে দৈনন্দিন শ্মশানে দাঁড়াবে।

জানি বহু কথা, কাজ, স্পর্শ বাকি ছিল,
ছিল বাকি প্রধান নির্ণয়,
গ্রন্থকে বিশ্বাস করে ভুল পড়ে গেলে,
যে-ভাবে কৈশোর প্রচলিত যৌবনে পৌঁছয়,
আজ তারও চেয়ে বেশী পরিশেষ
শ্লেষ
প্রয়োজন ছিল যেন;
না হলে এখনও শব্দের ভগ্নাংশে কেন
কলার খোসার মতো শুয়ে আছে রুনু
ওপরে প্রথম যে দেবে পা আছাড় খাবেই,

তারপর দূরে
ছুঁড়ে ফেলে দেবে তাকে আহত পথিক।

তোমার জামার মাপ ভুল ছিল রুদ্র।

আমি দায়ী নই

রাস্তার ঠিক ওপরে মুখ থুবড়ে মরে আছে একজন মানুষ;
না, আমি ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী নই।
তার বুকের কাছেই ছোট্ট একটা থালা,
থালায় একটুকরো অসমাপ্ত রুটি
মনে হয় মৃত্যুর আগেও সে খাচ্ছিল,
ওই ভিক্ষাক্ষুব্ধ ভগ্নাংশে এখন এসে পড়েছে
ভোরের চকচকে সূর্য
—অনেকটা ছুরির মতো, অপলক হত্যার সৌন্দর্যে
আঁকা প্রকৃতির নিজস্ব একটি ছবি।
কাছেই কয়েকটা কাক
কেবলই ডাকছে ডাকছে ডাকছে, কালো ওই সামান্য পাখিও
মানুষের আগে মৃত্যু টের পেয়ে শ্মশানকে সাবধান করছে!

শস্য, তুমি কার? যে ফলায় তার, এবং যে খায়
বোধহয় তারও! ওই পরলোকগত শুধু
দুটি ক্রুদ্ধ হাতের অভাবে
শেষ নিশ্বাসের আগেও ছিনিয়ে নেয় নি কিছু· তার পাশ দিয়ে
কতবার হেঁটে গেছে অন্নাদ মানুষ। ক্ষুধার প্রবল শব্দ
করতে-করতে কোনদিন সে টেরই পায় নি কোনও প্রেমিকার
নরম সোনালী মাংস, শুধু শুনেছে অসংখ্য তৃপ্ত মানুষের
স্বর্গীয় উদ্গার। কেউ এখনও বোঝে নি একজন সম্পূর্ণ ভিক্ষুক
একবারও সঠিক বেঁচে না উঠেই মরে গেছে;
আকাশের কাক এখন বন্ধ দুটি চোখ
খাদ্য ভেবে হয়তো ঠোকরাবে!

আমি এই মৃত্যুর জন্য দায়ী নই; আমি তো আকাশ লিখি
লিখি না মানুষ; আমি তো শিল্পের আক্ষরিক, আমি
শব্দকে ছন্দ করি, ছন্দকে শেখাই ভালবাসা, ভালবাসাকে ছোটাই
শরীরের স্বাদে যুদ্ধে; কেন-না প্রেমের কবিতা ছাড়া
কি কখনও কবিতা

হয়েছে? আমার তাই, চোখে জল আসবে না
আমি নিজের ছায়ার ভয়ে আলো থেকে অন্ধকারে
দৌড়তে দৌড়তে বলব, এই মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই
দায়ী নই, জানো, আমি দায়ী নই।

শনি

নগর ভেঙেছে, গ্রামও প্রায় নষ্ট হয়ে এল।
একা নদীটির পাশে বসে-থাকা কাক
খাদ্যের সন্ধানে উড়ে
আর ফিরে আসবে না।
এখন শ্মশান কোনও দূরে
পৃথক অগ্নির স্থান নয়,
নিশ্বাস বহন করে এমন প্রতিটি প্রাণ, অর্থাৎ মানুষ
আছে চতুর্দিক ব্যাপক শ্মশানে! আজ
কবিতা লেখার আগে, ছবি আঁকবার আগে যেটুকু সামান্য
খাদ্য পারে শিল্পকে জাগাতে
তাও নেই, পাখিরাও অনাহারে আছে!
চ্যাপলিন চিবিয়ে খান ফুল, ভুল অন্ধকার দেখে
সাহসী হয় না চাঁদ, যুবতী মনস্ক নয় যুবকের প্রতি।
নিজের চামড়া থেকে একজন কিছুটা মানুষ
কাঁচা মাংস নিয়ে প্রত্যহ বেরিয়ে এসে
বলে, 'ঈশ্বর, আমাকে খাও, খাও রাজনীতির অদৃশ্য
সলাঙুল শৃগাল এবং তার অভীষ্ট আঙুর; খাও কিছু
মুখোশমানুষ', কেন-না তারাই ভাঙছে, ভাঙছে, কেবলই
নগর ভাঙছে; গ্রামও প্রায় নষ্ট হয়ে এল।

সে

তুমি থেমে থাক, বয়স ফুরায়।
মাঘের সূর্যের মতো লাফ দিয়ে চলে যায় দিন,
সে ছিল ছায়ায় বসে, সে ছিল নিমগ্ন
চোখ দুটি গভীর ধ্যানীর মতো বোঁজা—ধ্যান মানে
আত্মার সংগ্রহ থেকে কিছু তুলে আনা; কিন্তু তাকে
তার আগেই খুঁজতে বেরিয়েছে গম্ভীর আঁধার;
ছায়াই সঘন হয়ে আঁধার হয়েছে, অথবা আঁধার
ছায়ার শরীরে এসে শিখেছে কবিকে, তা এখন
স্পষ্ট নয়, তবু শিয়রের পল্লবে-পল্লবে স্ফীত
বৃক্ষটি এখনও আকাশকে টানে, সবুজে মেশায়,
ডাকে পাখিদের, যারা উড়ে গিয়েও ফিরে আসে; তুমি
ফিরে আস নি কখনও; তোমার সুস্থির দেহে
রক্ত বড় দুরন্ত বালক, সে খেলে, কেবলই ভাঙে
তার ভাঙা পুতুল কখনও জোড়া লাগে না, তাই ক্রমশই সে
চুপ, তার চিন্তা আজ আর পরীক্ষিত হয় না বস্তুতে। শুধু
কয়েকটি অবাস্তব শব্দের টুকরো তপস্যার চারিদিকে
থাকে অপ্সরার মতন ছড়ানো। তারা মাঝেমধ্যে
নিজস্ব নূপুরে নাচে, ঋষির ঔরস কাড়ে, তার পরেই ফিরে আসে
পুরুষের নিজস্ব সন্ন্যাস।

ধ্যান যত ব্যবধানে ডাকে, দিন তত
খসে পড়তে থাকে, সে বসেই থাকে পাথরের মতো,
তার সময় ফুরিয়ে আসে বয়সের বেশি।

অভিমন্যু

খুব তাড়াতাড়ি তুমি বড় হয়ে উঠ না; হে শিশু
হে আমার ঈশ্বরের অধিক আগ্রহ।
এখন তোমার হাঁটু ডুবে আছে আশ্বিনের নবীন শিশিরে
ঘাস বারংবার পা ছুঁয়ে শিখছে তোমায়, তুমি কি
মন্দিরের সমান দেবতা? সেই মাটি ছুঁয়ে নত ফিরে আসা
ব্যক্তিগত বিগ্রহের কাছে! আমি রোজ কিছু
নক্ষত্রকে নামতে দেখি তোমার দু-চোখে
ভাবি, তুমি নিঃসঙ্গ রক্তের কোনও উদাসীন শ্লোক।

আমার চোখের জল শেষবার ঝরেছিল মায়ের প্রাচীন
অস্থি-র ওপরে, অগ্নিপরীক্ষিত ওই অসমাপ্ত হাড় যেন
নিষ্পলক চেয়েছিল নিঃস্ব এক প্রতিবিম্বের দিকে—সে কি আমি?
আমি মাকে শহরের পাথরে এনেছি, আমি তাঁকে
কয়েকটি সাজানো ঘর ব্যবহার করতে শিখিয়ে
কেড়ে নিয়েছিলাম অনেক আত্মীয় গাছ, অভিভাবক নদী।
আমি তাঁর সমাপ্ত সন্তান; তুমি শুরু, বর্তমান,
তুমি আমার মায়ের শেষ ক্ষমা, আমি চাই তুমি
খুব আস্তে আকাশের দিকে গড়ে ওঠ। কেননা, তোমাকে আমি
পারব না দিতে সামান্য স্বাস্থল অন্ন, প্রতিটি পথের মোড়ে
একাকী পেলেই ধিরবে যন্ত্রের শ্লোগান, দেয়ালে তাকালে দেখবে
একজনের অক্ষরের ঠিক ওপরেই কী বিশাল
হয়ে উঠছে ঠিকানা হারানো মানুষের নতুন অক্ষর:
দেখবে, ক্লান্ত মুখের ভাষার বেশি স্বাধীনতা বেঁচে নেই
ভারতীয় সূর্যের সংগ্রহে।
তবু আমি তোমাকে এনেছি এই কুরুক্ষেত্রের দ্বিধায়, তুমি
প্রতিশোধ নেবে, তুমি ভয়ংকর জেগে উঠবে
আকাশ-আছড়ানো প্রতিবাদে।
কিন্তু তার আগে কিছুদিন খেলা কর উদ্গত শিশিরে,
একা নক্ষত্রকে সংকেত পাঠাও, ধীরে, খুব ধীরে
প্রায় জাতিস্মর অহংকার নিয়ে তুমি বেড়ে ওঠ
হে আত্মজ অভিমন্যু, সর্বস্ব আমার।

নিজের জন্য

আমার জন্যই বারংবার কি ক্ষমা তোমার
হে পৃথিবী!
বালক যেমন একলা ভাঙে পুতুলটি তার
তেমনি কবি
ভাঙছে তোমায় একজন্মের শব্দ-দ্রোহে।
গড়ছে কিছু? গাছটি যেমন পাখির মোহে
নড়ছে এবং উঠছে উঁচু সব মানুষের শির ছাড়িয়ে
শব্দ তুমি উঠতে পার তেমন নীলে মেঘ নাড়িয়ে?
পারছ না; তাই
এখন একাই শ্মশান থেকে অগ্নি ওঠে
গাছ-ভাঙা কাঠ তাপটুকু তার মন্ত্রে ফোটে;
মৃত্যু ছাড়াই
তেমনি আমি ভুল ভেঙে যাই অঙ্গে তোমার
একলা কবি
আমার জন্যই বারংবার কি ঘনান্ধকার
হে পৃথিবী।